৩৫

আজকের কাগজ

তারিখ 26 NOV 1994 …

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২…

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা

আ. ন.স. হাবীবুর রহমান

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে বেসরকারি উদ্যোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের শতকরা নব্বই ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ই গ্রামীণ জনগণের প্রত্যক্ষ তৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একটা সময় পর্যন্ত পরিচালিতও হয়েছে। নিজের গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকার স্বপ্ন এ দেশের সব মানুষের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান রয়েছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে দুই গ্রামের মধ্যে শিক্ষকের তর্ক যুদ্ধের গল্প তো অনেকেই জানেন। কিন্তু স্বাধীনতার ২২ বছর পরে যখন আমরা দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষার কথা৹ বলছি, তখনও দেশের প্রায় অর্ধেকসংখ্যক গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই। গড়ে প্রায় ৩.২ বর্গ কিলোমিটার আয়তনে দুটো গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। দূরত্বের ফলে অনেক শিশুর বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া সম্ভব নয়। পাকিস্তানের পুরোটা সময়ই এদেশে শিক্ষা সংকোচনের নীতি কার্যকর করা হয়েছে। ভারত বিভাগের সময় এই ভূখণ্ডে যে পরিমাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তার সংখ্যা এক হাজার কমে যায়। অথচ, ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল মূলতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানব সন্তানকে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের অঙ্গীকার।

স্বাধীনতার পর আপামর জনগণের ন্যূনতম প্রত্যাশার মধ্যে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া ছিল অন্যতম। সবাই আশা করেছিল, এরপর থেকে আর কোনো শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হবে না। ঐ সময় সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাতে মানুষের প্রত্যাশা পূরণের কিছু ছিল। সকল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ ছিল তার মধ্যে অন্যতম। ঐ সময়ই ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়, ছাত্রছাত্রীরা স্কুল থেকে বিনামূল্যে পোশাক পায়। এক সময় স্কুলে টিফিন দেয়াও শুরু করা হয়। ঐসব পদক্ষেপের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যায় প্রায় দেড়গুণ পর্যন্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যাশিত এই পরিবর্তনগুলো পরিকল্পিতভাবে প্রয়োগ না করার ফলে দেখা দেয় অনেক সমস্যা। ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ দ্বারা শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা বিধান করা এবং বিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ ছিল প্রত্যাশিত। বাস্তবে এই পদক্ষেপে অনেক নেতিবাচক ফল দেখা দেয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের অনেকেই নিজেদেরকে সরকারি আমলা ভাবতে শুরু করেন। জনগণের অংশগ্রহণ ও তত্ত্বাবধানকে তারা বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে থাকেন। শিক্ষকের নিয়োগ, বদলী ইত্যাদিতে স্থানীয় জনগণের মতামতের কোন মূল্য দেয়া হলো না। যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে স্থানীয় মানুষ নিয়মিত চাঁদা দিয়েছেন, শারীরিক শ্রম দিয়েছেন, সেই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি এ সময় তাঁরা হয়ে গেলেন উদাসীন। বিদ্যালয় গৃহের একটি জানালা ভাঙলো তো সরকারি সাহায্যে মেরামতের জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে পুরো গৃহটিই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণের অভাবে পরিচালনা ব্যবস্থায় আসে নৈরাজ্য। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি এবং শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ইত্যাদি নৈরাজ্যেরই ফল। ফলে দরিদ্রতর জনগণের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ আরো কমে গেল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশে প্রাথমিক শিক্ষার এই অধঃগতি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ, শিশু অধিকার সনদ এবং আমাদের সংবিধানে শিশুর শিক্ষার যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা এমনিভাবে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

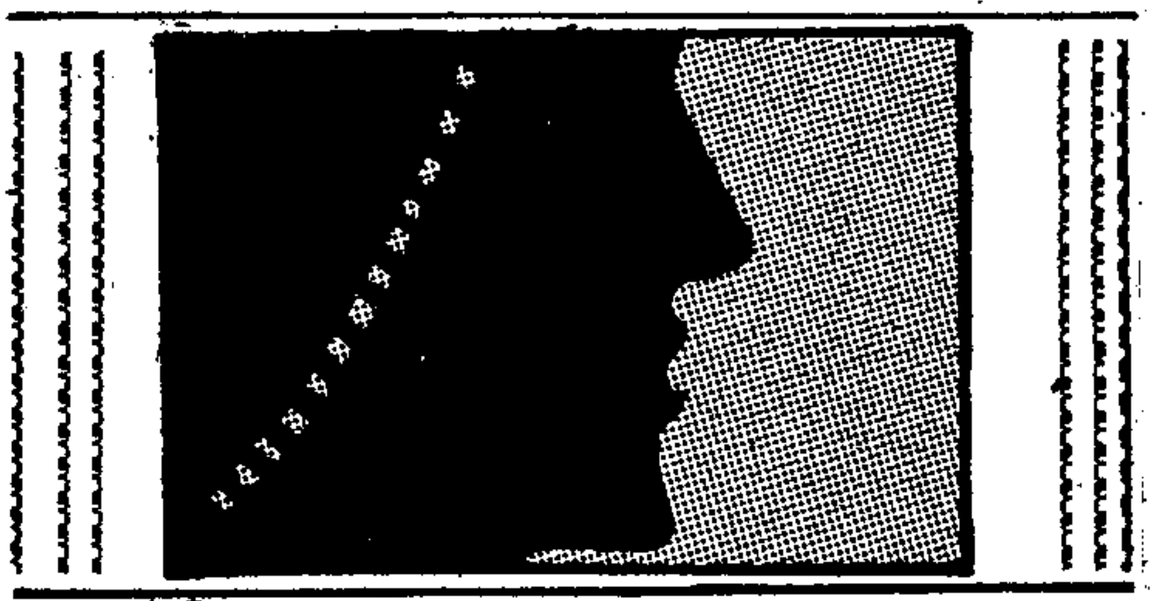

আমাদের দেশে ৬ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা দুই কোটিরও উপরে। এর মধ্যে দেড় কোটি শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। এদের শতকরা সত্তর ভাগই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের আগেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে

পড়ে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ঝরে পড়ার এই হার কমাতে সমর্থ হয়নি। সংকুলানের দ্বিগুণ সংখ্যক ছাত্রভর্তি, শিক্ষকের স্বল্পতা, আসবাবপত্রের অভাব ইত্যাদি সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নাজুক অবস্থায় নিয়ে এসেছে। এই অবস্থাকে যে সব বৈশিষ্ট দ্বারা তুলে ধরা যায় সেগুলো হলোঃ (১) দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল। (২) স্কুলগামী বয়সের একতৃতীয়াংশই বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। (৩) ভর্তিপ্রাপ্ত শিশুর শতকরা সত্তরভাগ মৌলিক সাক্ষরতা অর্জনের আগেই ঝরে পড়ে। (৪) প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রণীত নয়। (৫) পাঠদানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যবহার হচ্ছে না। (৬) শিক্ষক প্রশিক্ষণের লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। (৭) ছাত্র শিক্ষকের অসম অনুপাত পাঠদান পরিবেশকে ব্যাহত করছে। (৮) স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ কমে যাওয়ায় পরিচালনায় অব্যবস্থা বিরাজ করছে। (৯) প্রাথমিক শিক্ষার নামে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা চললেও তা কোন সুফল বয়ে আনেনি। (১০) সর্বোপরি সকল শিশুর জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় এমন কোন প্রাথমিক শিক্ষা নীতিও দেশে বিদ্যমান নেই।

প্রাথমিক শিক্ষার বিরাজিত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টাই হচ্ছে মুখ্য। এ ব্যাপারে সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে। দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে সরকার এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। অতীতে বিত্তবানদের অনেকেই নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার স্বার্থেই প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এর বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতেন। কিন্তু বর্তমানে তাদের সন্তানদের জন্যে কিন্ডারগার্টেন জাতীয় বিকল্প প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ব্যবসায়িকভাবে পরিচালিত ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বড় লোকদের দুশ্চিন্তা দূর করেছে। ফলে সাধারণ মানুষের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা কেমন চলছে তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। ধীরে ধীরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ যেন দরিদ্র জনগণের জন্যে প্রদত্ত একটি রিলিফ সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা প্রথমিক শিক্ষা বিকাশের অন্তরায়। প্রাথমিক শিক্ষার মতো মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়কে কোনক্রমেই বৈষম্যের শিকার হতে দেয়া উচিত নয়। খুব সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া একই কারিকুলামে একই পরিবেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে সমগ্র শিশু সমাজের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার দ্বার অবারিত হওয়া উচিত।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে আমাদের সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের ব্যবস্থা করা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষার অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠলেও দরিদ্র জনগণের একটি অংশ তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারবেন না। আবার দরিদ্র পরিবারে অনেক সন্তানই নানা কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়বে। এই অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি ধারা বিদ্যমান থাকা উচিত। শ্রমজীবী পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্যে মৌলিক সাক্ষরতার ব্যবস্থা করতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খুবই কার্যকর। দেশের প্রায় পাঁচশত বেসরকারি সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালনায় ব্যাপকভাবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। প্রাথমিক শিক্ষার তুল্য একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা যায় যার মাধ্যমে পাঁচ বছরের কম সময়েও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান সম্ভব। জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ছাত্র শিক্ষকের বাস্তবসম্মত অনুপাত, কার্যকর প্রশিক্ষণ, যথাযথ তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ এবং ভর্তির বয়স সর্বনিম্ন আট বছর নির্ধারণ করে প্রাথমিক শিক্ষাদানে এই ব্যবস্থা ফলদায়ক হতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশু অত্যাবশ্যকীয় যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন। এই খাতে প্রচুর অর্থও ব্যয় করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের সার্থকতা নিয়ে সরকারের উর্ধ্বতন মহলে অসন্তুষ্টি রয়েছে। কিছু সংস্থা এই প্রকল্পটিকে নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক মুনাফার কাজে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ছোট ছোট সংস্থাকে এই দায়িত্ব প্রদান করা হলে দেশের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম 'ইনফেপ' এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয় প্রতিষ্ঠান 'এডাব' যৌথভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। সারাদেশে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রীয় সেল হিসেবে ইনফেপ কাজ করতে পারে। দেশে কোন সময় কতটি শিক্ষা কেন্দ্রে কতজন শিশু লেখাপড়া করছে, আর কতটি সংস্থা এতে জড়িত আছে, কে কীভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এসব ইনফেপ মনিটরিং করতে পারে। অন্যদিকে 'এডাব' বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে গতিবেগ সঞ্চারিত করার জন্যে নিতে পারে নানা পদক্ষেপ। এডাবের রয়েছে বেশ কয়েকটি অনুসংগঠন। এসব অনুসংগঠন বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় আঞ্চলিকভাবে বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে, ছোট সংস্থাগুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যেও নানারকম উদ্যোগ নিতে পারে। সরকারি এবং বেসরকারি সমন্বয় প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা হয়ে উঠতে পারে আরো শক্তিশালী, আরো কার্যকর।

আমাদের দেশের সাক্ষরতার হার এখনো ৩০% এর নিচে। বিশ্বের সর্বোচ্চ নিরক্ষর জনসংখ্যা অধ্যুষিত আটটি দেশের একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার সময় আমাদের যে মোট জনসংখ্যা ছিল, বর্তমানে নিরক্ষর নারীপুরুষের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। এরকম অবস্থা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন অসম্ভব ব্যাপার। চল্লিশ বছর যাবৎ পরিবার পরিকল্পনা খাতে বিপুল পরিমাণে ব্যয় করেও ফলাফল হয়েছে খুবই সামান্য। একমুঠো গুড়, এক চিমটি লবণ আর আধা লিটার কলের পানির সাহায্যে স্যালাইন তৈরির সহজ বার্তাটিও আমরা সার্থকভাবে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছুতে পারিনি। শতকরা আশি ভাগ শিশুর পুষ্টিহীনতার কোনো প্রতিকার করা যাচ্ছে না। সামন্ত আমলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ সমাজে বিদ্যমান। এই পটভূমিতেই দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের চিন্তা করতে হবে। দেশে সাক্ষরতার হার বাড়লে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহীতার সংখ্যা বাড়বে। স্বাস্থ্য সম্বলিত বার্তার কার্যকারিতা পরিদৃষ্ট হবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়বে। ধর্মান্ধতার অবসান হবে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্যে এমন একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচি গ্রহণ করা খুবই প্রয়োজন যার দ্বারা আগামী শতাব্দীর শুরুতে আমাদের দেশের সাক্ষরতার হার শতকরা ৬০ এ উন্নীত হয়। স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত না থাকা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও মারাত্মক বিপর্যয় এসেছে। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ তথা আপামর জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পদদলিত হয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক ধারায় নিরক্ষরতাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে জাতীয় ঐকমত্যের মাধ্যমে একটি সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে তা সফল হবে নিঃসন্দেহে।

আ. ন. স. হাবীবুর রহমান : একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা।